



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - v, Issue - iii, Published on July issue 2025, Page No. 695 - 704

Website: <https://tirj.org.in>, Mail ID: info@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

দেশাঅবোধের উন্মেষে মৃত্যুর ভূমিকা : যতীন্দ্রনাথ দাসের (১৯০৪-১৯২৯) আত্মোৎসর্গের প্রেক্ষিতে একটি আলোচনা

গুরুশংকর বারিক

গবেষক, রাজা নরেন্দ্র লাল খান মহিলা কলেজ, পশ্চিম মেদিনীপুর

Email ID : gurusankarbarik@gmail.com

Received Date 25. 06. 2025

Selection Date 20. 07. 2025

Keyword

Hunger strike,
Hindustan
Republican
Association,
Lahore Conspiracy
Case,
Dadhichi,
Factional politics
of Bengal.

Abstract

India's freedom struggle has witnessed the fearless self-sacrifice of revolutionaries. Revolutionary ideologies spread rapidly in Bengal from the early 20th century. The secret assassinations, robberies, and weapons looting programs of the revolutionaries were a cause of concern for the British government. The government took a strict stance to suppress all these revolutionary programs. The police could not stop them in any way, even with lathi charge, firing, imprisonment, and hanging. Rather, the revolutionary movement intensified despite police repression. The death of the revolutionaries greatly inspired the country's youth. Jatindranath Das set a unique example in this regard. His hunger strike demanding the dignity of a political prisoner had a huge impact on the public. His unwavering willpower became an ideal for the youth. His death brought a surge of patriotism across the country. He wanted to do this at the cost of his own life. Jatin Das' death brought temporary relief to the factional politics of Bengal. The leaders of Bengal paid their last respects to him together, Putting aside all disputes. In the Puranas, Rishi Dadhichi voluntarily sacrificed his life to kill the Vrtrasur. A weapon to kill the demon was prepared from his bones. Here Jatindranath Das laid the foundation for the national movement at the cost of his life. The main topic of this article is the impact of Jatindranath Das' death.

Discussion

“আজ জেলে বন্দী অবস্থায় যতীন দাস মৃত্যু মুখে পতিত হতে পারে, কিন্তু আমরা ব্রিটিশ সরকারকে এই বলে সাবধান করে দিতে চাই যে, এক যতীন দাসের চিতার আগুন থেকে হাজার হাজার যতীন দাস জন্ম নেবে, যাঁরা এই সরকারের ভিত্তি মূলকে টলিয়ে দেবে।”

যতীন দাসের অনশন চলাকালীন ৩-রা আগস্ট, ১৯২৯ সরকারকে সাবধান করে *লিবার্টি* উপরের কথা গুলি লিখেছিল। *লিবার্টি*র ভবিষ্যৎবাণী পরবর্তীকালে অক্ষরে অক্ষরে মিলে যায়। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মবলিদান নতুন বিষয় না হলেও যতীন দাসের মত কেউ মৃত্যুকে হাতিয়ার করেনি। এক মৃত্যু দিয়ে তিনি আসমুদ্র হিমাচল দেশপ্রেমের জোয়ারে

ভাসিয়ে দেন। তিনি প্রকৃতই মৃত্যুঞ্জয়ী। বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে মহাত্মা গান্ধীর গণ আন্দোলনের উদ্যোগ বাংলায় বৈপ্লবিক কর্মসূচিতেও পরিবর্তন নিয়ে আসে। একবছরে স্বরাজ লাভের প্রতিশ্রুতিতে বিপ্লবীরা জাতীয় আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। সেই থেকে বাংলার রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হয়ে ওঠে বিপ্লবীরা। চিত্তরঞ্জন দাশ নিজে বৈপ্লবিক কর্মপন্থায় বিশ্বাসী না হলেও রাজনৈতিক সমর্থন আদায়ের জন্য তিনি বিপ্লবীদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন।^১ বিপ্লবীদের এই সহচর্য কংগ্রেসের স্কুল-কলেজ ত্যাগী স্বেচ্ছাসেবকদের ব্যাপক প্রভাবিত করে। তাঁদের সংস্পর্শে তরুণ যতীন্দ্রনাথ কংগ্রেসের পাশাপাশি বৈপ্লবিক আন্দোলনেও সামিল হয়ে পড়েন। তাঁর তৈরি করা বোম ভগৎ সিং আইন সভায় নিক্ষেপ করে। এই সূত্রধরে তিনিও লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত হয়ে পড়েন। লাহোর জেলে বন্দী থাকাকালীন তাঁর আমরণ অনশন সারা দেশে ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি করে। তাঁর মৃত্যু দেশের যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করে।

যতীন্দ্রনাথ দাস সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক বইপত্রে তাঁর জীবন কর্মকান্ড আলোচিত হয়েছে। অদম্য ইচ্ছাশক্তিকে কাজে লাগিয়ে তিনি যেভাবে জীবনের শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত লড়াই করেন তার বর্ণনা পাওয়া যায়। তবে তাঁর মৃত্যুর পর বাংলা তথা সমগ্র ভারতবর্ষে যে অভূতপূর্ব উত্তেজনার সৃষ্টি হয় তার ছবি ধরা পড়েনি। তাঁর ৬৩ দিন সংগ্রামের ফলাফল অধরা থেকে গিয়েছে অধিকাংশ আলোচনায়। আলোচ্য নিবন্ধে তৎকালীন রাজনীতিতে যতীন্দ্রনাথ দাসের মৃত্যুর প্রভাব অনুসন্ধান মূল উদ্দেশ্য। সমসাময়িক সংবাদপত্র, পত্রিকা, গোয়েন্দা দপ্তরের প্রতিবেদন প্রভৃতি উপাদানের উপর নির্ভর করে সমসাময়িক রাজনীতিতে যতীন্দ্রনাথ দাসের মৃত্যুর প্রতিক্রিয়া অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হয়েছে।

কলকাতার এক মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান যতীন্দ্রনাথ দাস (১৯০৪-১৯২৯) কলেজ ত্যাগ করে অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে আন্দোলন পরিচালনা করার সময় তিনি গ্রেপ্তার হন।^২ কারামুক্তির পর তিনি বঙ্গবাসী কলেজে পড়াশুনা শুরু করেন। এই সময় তাঁকে দক্ষিণ কলকাতা কংগ্রেস কমিটির সহকারী সম্পাদক পদে নির্বাচিত করা হয় (১৯২৪)।^৩ এক বছরে স্বরাজ না আসায় বিপ্লবী কর্মপন্থা আবার সক্রিয় হয়ে ওঠে। অল্প কিছু দিনের মধ্যেই তিনি শচীন্দ্রনাথ সান্যাল প্রতিষ্ঠিত *হিন্দুস্থান রিপাবলিকান এসোসিয়েশনের* (১৯২৪) গুরুত্বপূর্ণ কর্মী হয়ে উঠেন। তাঁর সংগৃহীত অস্ত্র কাকোরী স্টেশনের কাছে ট্রেন ডাকাতিতে ব্যবহার করা হয়। পুলিশ কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলার তদন্তের সময় যতীন্দ্রনাথের ছদ্মনাম ‘কালীবাবু’ ও ‘কামিনী কাকা’ সম্পর্কে পরিচিত হয়।^৪ এই সূত্রধরে পুলিশ যতীন্দ্রনাথকে তাঁর ভবানীপুরের বাড়ী থেকে গ্রেফতার করে (২৫-শে ডিসেম্বর, ১৯২৪)। কিন্তু শনাক্ত করতে না পারায় তাঁকে ‘বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সের’ আওতায় বন্দী করা হয়।^৫ এই কারাবাসের সময় তিনি ময়মনসিংহ জেলের অধিকর্তা কর্ণেল ও’ব্রায়েনকে মাথা নীচু করে ‘সালাম বড় সাহেব’ বলতে অস্বীকার করে প্রহৃত হন। এর প্রতিবাদে তিনি পান্নালাল মুখার্জীর সঙ্গে অনশন শুরু করেন। ২১ দিন অনশন চলার পর গোয়েন্দা বিভাগের ডি. আই. জি লোম্যানের হস্তক্ষেপে ও’ব্রায়েন যতীন্দ্রনাথের কাছে ভুল স্বীকার করায় অনশন উঠে যায়।^৬ ১৯২৮-এর অক্টোবরে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়।

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা ও ঐতিহাসিক অনশন

মুক্তি লাভ করে তিনি জাতীয় কংগ্রেসের কলকাতা (১৯২৮) অধিবেশনের জন্য গঠিত সুভাষচন্দ্র বসুর ভলেন্টারি বাহিনীতে ‘বি’ ব্যাটালিয়ানের মেজর হিসাবে যোগদান করেন।^৭ অপরদিকে ভগৎ সিং স্যান্ডার্সকে হত্যা করে (১৭-ই ডিসেম্বর, ১৯২৮) ছদ্মবেশে কলকাতায় চলে আসেন। এখানে তিনি *হিন্দুস্থান রিপাবলিকান এসোসিয়েশনের* পুরানো সদস্য যতীন্দ্রনাথ দাসের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করেন। ভগৎ সিংয়ের অনুরোধে যতীন্দ্রনাথ বোম তৈরির কৌশল শেখাতে রাজি হয়।^৮ আগ্রার ভাড়া বাড়িতে যতীন্দ্রনাথ দাস বোম তৈরির প্রশিক্ষণ দেয়। তাঁর প্রস্তুত করা বোম ভগৎ সিং এবং বটুকেশ্বর দত্ত দিল্লীর কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় নিক্ষেপ করেন (৮-ই এপ্রিল, ১৯২৯)। পুলিশ তদন্তে নেমে এক আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্রের যোগসূত্র আবিষ্কার করে। এই ষড়যন্ত্রের অন্যতম সন্দেহভাজন যতীন্দ্রনাথকে গ্রেফতার করে (১৪-ই জুন, ১৯২৯) তারা লাহোরে নিয়ে যায়।^৯ ১০-ই জুলাই স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট রায় সাহেব শ্রীকৃষ্ণের এজলাসে শুরু হয় ঐতিহাসিক লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার শুনানি। যার মূল অভিযোগ ছিল স্যান্ডার্স হত্যা। সমস্ত অভিযুক্তকে ওইদিন আদালতে হাজির করা হয়।

বিচার পত্রীয়া চলার সময় তাঁরা আদালতে পরস্পরের সাথে মিলিত হয়। ইতিমধ্যে ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত রাজনৈতিক বন্দীর মর্যাদার দাবিতে ১৫-ই জুন থেকে আমৃত্যু অনশন শুরু করে। এবার অনান্য বন্দীরাও তাঁদের সমর্থনে অনশন শুরু করার সিদ্ধান্ত নেয়। যতীন্দ্রনাথ প্রথম থেকেই অনশনের বিরুদ্ধে ছিলেন।^{১১} তিনি বলেন –

“রিভালবার পিস্তল নিয়ে লড়াই করার চেয়ে অনেক বেশী কঠিন এক অনশন সংগ্রামে আমরা নামছি। অনশন সংগ্রামীকে তিল-তিল করে মৃত্যুর মুখে এগিয়ে যেতে হয়। শত্রুর সঙ্গে সম্মুখ লড়াইয়ে গুলির আঘাতে প্রাণ দেওয়া বা ফাঁসির রশিতে জীবন দেওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ। অনশনে অংশ নিয়ে পিছু হটলে বিপ্লবীদের প্রতিষ্ঠা ধুলায় লুটিয়ে পড়বে। তাই বলছি যে যোগ দিয়ে পিছিয়ে পড়ার চেয়ে প্রথম থেকেই অনশনে যোগ না দেওয়াই সমীচীন।”^{১২}

অনশনের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করায় জয়দেব কাপুরের মত কয়েকজন তাঁকে ভীরা বলে উপহাস করেন। অন্যতম অভিযুক্ত শ্রীবিজয় সিংহ পরবর্তীকালে ‘ডেকান ক্রনিকল’-এ (১৩.০৯.১৯৬৬) লেখেন – ‘আমাদের উৎসাহ তখন এতই উচ্ছ্বসিত, যে তার সতর্ক বাণীতে কর্ণপাত করার মত মেজাজ তখন আর আমাদের ছিল না। আমরা আমাদের পথে এগিয়ে গেলাম।’^{১৩} সকলের উৎসাহে যতীন্দ্রনাথ দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত অনশনের সংকল্প নেয়। ১৩-ই জুলাই জয়দেব কাপুর আদালতে ভগৎ সিংদের সমর্থনে অনশন শুরু করার কথা ঘোষণা করেন।

অনশনের দশ দিন থেকে অনশনকারীদের অবস্থা খারাপ হতে শুরু করে। অনশনের এগারো দিন থেকে সরকারি ডাক্তার জোর করে দুধ খাওয়ানো শুরু করে। এই সময় ধস্তাধস্তিতে যতীন্দ্রনাথের শ্বাসনালিতে দুধ চলে যায়। তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন। তাঁর শরীরে নিউমোনিয়ার লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই অবস্থাতেও ওষুধ পর্যন্ত না খেয়ে তিনি অনশন চালিয়ে যান। এরপর মেডিক্যাল অফিসার আর জোর করে খাওয়াতে রাজি হয়নি।^{১৪} অনশনের আঠেরো দিন থেকে তাঁর শারীরিক অবস্থার আরো অবনতি হয়। তবুও তিনি নার্স রাখতে না চাওয়ায় তাঁর ভাই কিরণচন্দ্র দাসকে জেল হাসপাতালে থাকার অনুমতি দেওয়া হয়। কিরণচন্দ্র দাস সুভাষচন্দ্র বসুকে টেলিগ্রামে জানায় ‘Dada’s condition hopeless. Pulse 45. Doctors silent. Wire instruction.’^{১৫} জেল কতৃপক্ষ জলে গ্লুকোজ ও ব্র্যান্ডি মিশিয়ে দেওয়ায় তিনি জল খাওয়াও বন্ধ করে দেয়। জওহরলাল নেহরু তাঁকে দেখতে গিয়ে বলেন – ‘যতীন দাসের অবস্থা খুবই খারাপ। তিনি এতই দুর্বল হয়ে পড়েছেন যে বিছানায় পাশ ফিরে শুতে পারছেন না। তাঁকে খুব ধীরে ধীরে কথা বলতে হচ্ছে। বস্তুত তিনি একটু একটু করে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন।’^{১৬} এই অবস্থায় ভগৎ সিংকে কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে নিয়ে এসে যতীন্দ্রনাথকে দুশ ইনজেকশন নিতে রাজি করানো হয়।

৪-ঠা সেপ্টেম্বর থেকে তাঁর জ্বর, বমি আর অসহ্য মাথার যন্ত্রণা শুরু হয়। কিরণচন্দ্র দাস সুভাষ চন্দ্র বসুকে টেলিগ্রাম করেন ‘দাদা যে কোন মুহূর্তে মারা যেতে পারে। সংবাদপত্রে নজর রাখবেন।’^{১৭} ৭-ই সেপ্টেম্বর জ্বর ও বমি বাড়ার সাথেসাথে হাত-পা অবশ হয়ে যায়। যতীন্দ্রনাথের শারীরিক অবস্থা ক্রমশ সঙ্গীন হয়ে পড়ে। ১৩-ই সেপ্টেম্বর সকাল থেকে জেল কতৃপক্ষ তাঁর সকল সঙ্গীকে হাসপাতালে একত্রিত হওয়ার অনুমোতি দেয়। শেষ সময় টুকু তাঁরা এক সঙ্গে কাটায়। তাঁকে ভীরা বলার জন্য জয়দেব কাপুর কাঁদতে কাঁদতে ক্ষমা চায়।^{১৮} বিজয় কুমার সিংহ এবং কিরণচন্দ্র গাইলেন যতীন্দ্রনাথের প্রিয় গান ‘একলা চলোরে’। দুপুর ১.০৫ মিনিটে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ৬৩ দিনের লড়াই থেমে যায়। সবাই তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করে। এরপর সমস্ত বন্দীদের বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে সমগ্র জেলটা যেন কেঁপে ওঠে।

কিরণচন্দ্র দাস জেল গেটের কাছে এসে গোপীচাঁদ ভার্গবকে মৃত্যুর খবর তাঁর পিতা এবং সুভাষচন্দ্র বসুকে টেলিগ্রাম করে দিতে বলেন। এরপর অগ্নি স্কুলিপের মত সারা দেশে খবর ছড়িয়ে পড়ে। দোকান, বাজার, অফিস, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে লাহোর শহরটাই যেন স্তব্ধ হয়ে যায়। রাস্তায় শুধু শোকস্তব্ধ মানুষদের খালি পায়ে, অনাবৃত মস্তকে মৌন মিছিল। বিকেল ৪.৩০-এ রাজবন্দীরা কাঁধে করে তাঁর দেহ জেল গেটে নিয়ে যায়। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে গোটা শহরটাই তখন জেল গেটের বাইরে ভেঙ্গে পড়েছে এক মৃত্যুঞ্জয়ীকে শেষ সন্মান জানাতে। অপেক্ষারত জনতার সম্মুখে লাহোরের সুপারিনটেনডেন্ট হ্যামিল্টন হার্ডিং তাঁকে সামরিক কায়দায় অভিবাদন জানায়। তাঁর নশ্বর দেহ ফুলে ঢেকে দেওয়া হয়।

তারপর শহীদের দেহ নিয়ে এক বিরাট শোভাযাত্রা শহর পরিক্রম করে এগিয়ে চলে। পথের দু'পাশের বাড়ির ছাদ, বারান্দা থেকে মহিলারা শঙ্খ ধ্বনি এবং পুষ্প বৃষ্টি করে শহীদকে সম্মান জানায়। কিছু লোক শবদেহের উপর খুচরো পয়সা ফেলে আবার তুলে নেয় সন্তানের গলায় পরাবার জন্য যাতে তাঁদের সন্তানও যতীন দাসের মত বীর হয়। রাত্রি ন'টার সময় মিছিল দিল্লী গেটে পৌঁছে এক বিরাট জনসভার রূপ নেয়। ড. মহম্মদ আলমের সভাপতিত্বে বক্তারা জনগণকে যতীন্দ্রনাথের আদর্শে উজ্জীবিত হওয়ার আহ্বান করেন। এই সভাতেই ড. আলম এবং ড. গোপীচাঁদ ভার্গব আইনসভা থেকে পদত্যাগ করেন। সভার পর শবাধার রেলের বিশেষ গাড়িতে রাখা হয়। সেই রাতেই কিরণচন্দ্র গত আড়াই মাস ধরে সহযোগিতা করার জন্য সংবাদপত্রে পাঞ্জাবের মানুষকে কৃতজ্ঞতা জানায়।

পরের দিন (১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯২৯) ভোর থেকে যতীন্দ্রনাথকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে লাহোর স্টেশনের বাইরে বিরাট জমায়েত হয়। ভীড় সামলাতে পুলিশ স্টেশনে ঢোকার রাস্তা বন্ধ করে দেয়। সকাল ৬.৪০ মিনিটের ট্রেন লাহোরকে শেষ বিদায় জানিয়ে কলকাতার পথে রওনা হয়। কিরণচন্দ্র দাসের সঙ্গে আসেন এ. সি. বালি, মোহনলাল গৌতম, বানারসী দাস, প্রমিলা দেবী এবং দুর্গা দেবী। মথুরাতে কিরণচন্দ্রের সাথে দেখা হয় পলাতক চন্দ্র শেখর আজাদ ও ভগবতী চরণ ভোরার। কানপুর স্টেশনে অশ্রুসিক্ত নয়নে যতীন্দ্রনাথকে শেষ বিদায় জানায় জওহরলাল নেহরু। যতীন্দ্রনাথের নশ্বর দেহ লাহোর থেকে কলকাতা আসার সময় দিন হোক বা রাত প্রতিটি স্টেশনে মানুষের ভিড় উপচে পড়ে। সবাই বীরকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে চায়। এক ঐতিহাসিক যাত্রার শেষে ১৫ সেপ্টেম্বর রাত্রি ৮টা ১৫ মিনিটে ট্রেন এসে থামে হাওড়া স্টেশনের ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মে। হাওড়া স্টেশনে তখন বিরাট জনসমাগম। বীরকে শ্রদ্ধা জানাতে সকলেই এসেছে খালি পায়ে। যতীন দাসের বঙ্গবাসী কলেজের ছাত্ররা শবাধার কাঁধে করে হাওড়া টাউন হলে নিয়ে যায়। যতীন্দ্রনাথকে একবার চোখের দেখা দেখতে হাওড়া টাউন হলে ভিড় উপচে পড়ে।^{১৬}

১৬ সেপ্টেম্বর সকাল থেকে মানুষের ভিড় বাড়তে থাকে। পুলিশ কমিশনার শোভাযাত্রা যাওয়ার জন্য হাওড়া ব্রিজ, হ্যারিসন রোড, কলেজ স্ট্রিট, ওয়েলিংটন স্ট্রিট, ওয়েলসলি স্ট্রিট, কর্পোরেশন স্ট্রিট, চৌরঙ্গি রোড, রসা রোড, আশুতোষ মুখার্জি রোডে যান চলাচল বন্ধের নির্দেশিকা আগেই জারি করেন। সকাল ৬.৩০-এ যতীন্দ্রনাথের অন্তিম যাত্রা শুরু হয়। যতীন্দ্রনাথের অক্লান্ত পরিশ্রমে গড়ে তোলা ভলেন্টিয়ার্স বাহিনী তাঁর অন্তিম যাত্রার নেতৃত্ব দেয়। অশ্বারোহী বাহিনী, ড্রাম এবং বিউগল বাদকেরা, লতিকা বোসের নেতৃত্বে ছাত্রীরা, সুসজ্জিত ভলেন্টিয়ার্স বাহিনী, বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন এবং সব শেষে সংকীর্তন দল নিয়ে বিরাট শোভাযাত্রা এগিয়ে চলে কেওড়াতলার দিকে। এই শোভাযাত্রা যত এগিয়েছে কলেবরে বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকারি হিসেবে অন্তত পক্ষে পাঁচ লক্ষ লোক অংশ নিয়েছিলেন। তাঁর শিক্ষক তথা বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক নৃপেন্দ্রচন্দ্র ব্যানার্জীর মতে সংখ্যাটা কয়েক লক্ষ।^{১৭} চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুর পর এতবড় শোভাযাত্রা শহরবাসী দেখেনি। রাস্তার ধারে জমায়েত করে থাকা অগণিত মানুষ তাঁকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে। কলকাতা পৌরসভা এবং দক্ষিণ কলকাতার কংগ্রেস অফিসে শহীদকে ফুলের মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয়। চিত্তরঞ্জন সেবা সদনের ডাক্তার এং নার্সরা সাদা পদ্ম দিয়ে তাঁকে সম্মান জানায়। অবশেষে দুপুর একটার সময় দীর্ঘ শোভাযাত্রা কেওড়াতলা মহাশ্মশানে পৌঁছায়। ভলেন্টিয়াররা শবাধার এক উঁচু বেদীর উপর রেখে সামরিক কায়দায় অভিবাদন জানায়। তারপর চন্দন কাঠের চিতার উপর তাঁর নশ্বর দেহ স্থাপন করা হয়। বিকেল চারটের সময় ব্যান্ড দলের জাতীয় সুর ও শঙ্খ ধ্বনির মধ্যদিয়ে কিরণচন্দ্র মুখান্নি করে। কিরণচন্দ্র দাস, সুভাষচন্দ্র বসু, নৃপেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, যতীন্দ্রনাথের সাথীরা এবং লাহোর থেকে আগত ডিফেন্স কমিটির প্রতিনিধিরা সকলে একসাথে পবিত্র গঙ্গা জল দিয়ে যতীন দাসের চিতার আগুন নির্বাপন করেন।

যতীন্দ্রনাথ দাসের মৃত্যুর প্রতিক্রিয়া

যতীন্দ্রনাথের মৃত্যুর খবর সমগ্র দেশবাসীর হৃদয়ে শোকের ছায়া নিয়ে আসে। দিল্লীতে কালো পতাকা নিয়ে শোক মিছিল বার হয়।^{১৮} পণ্ডিত মতিলাল নেহরু কেন্দ্রীয় আইন সভার কাজ মূলত্ববির প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তিনি যতীন্দ্রনাথের মৃত্যুর জন্য সরকারকে দায়ী করে বলেন - ‘আমার অভিযোগ এটাই যে - সরকারকে মানবিক নীতি দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত,

সেই মানবিক বোধের একান্ত অভাব দেখা দিয়েছিল সরকারের মধ্যে।^{২২} তাঁর নশ্বর দেহ লাহোর থেকে কলকাতা আনার পথ জুড়ে দেশপ্রেমের উদ্দাম ঢেউ বয়ে যায়। ১৮-ই সেপ্টেম্বর এলাহাবাদ ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের মিটিংয়ে যতীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা জানিয়ে মূলতুবি ঘোষণা করা হয়। বোম্বের সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের ছাত্ররা ‘যতীন দাস কি জয়’ শ্লোগান দিয়ে মিছিল করে। ২১-শে সেপ্টেম্বর আজমীরে জমুনলাল বাজাজের নেতৃত্বে কালো পতাকা নিয়ে মিছিল হয়। ২৫-শে সেপ্টেম্বর পাটনায় ‘যতীন দাস দিবস’ পালিত হয়। মিরাত কলেজের ছাত্ররা জাতীয় সঙ্গীত গেয়ে শহর পরিক্রমা করে। লক্ষ্মী পৌরসভার মিটিং পিছিয়ে দেওয়া হয়। জামালপুরে বড় সভা হয়। পুনার ছাত্ররা হরতাল এবং উপবাস পালন করে। দৌলতপুর কলেজে সম্পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। মাদ্রাজের গোখলে হলে সভা হয়।^{২৩} শুধু মৃত্যুর পর নয়, তাঁর অনশনের খবর সারা দেশে আলোড়ন সৃষ্টি করে। তাঁর মৃত দেহ কলকাতা আনার জন্য প্রয়োজনীয় খরচ দেওয়ার জন্য তৎপরতা দেখা যায়। দেশের মানুষ যতীন্দ্রনাথ দাসের লড়াইকে শ্রদ্ধা জানাতে চায়। বাংলা থেকে সুভাষচন্দ্র বসুর পাঠানো টাকা ফেরৎ পাঠানোর জন্য কিরণচন্দ্র দাসের চিঠি আসতে থাকে। দিল্লীর এক মুসলিম ব্যবসায়ী পঞ্চাশ টাকা পাঠায়। সরোজিনী নাইডুর নেতৃত্বে বোম্বে প্রভিন্সিয়াল কংগ্রেস কমিটি ১০০ টাকা পাঠায়। অমৃতসর কংগ্রেস কমিটির পক্ষ থেকে সন্তরাম শেঠ পুরো খরচ বহন করার কথা ঘোষণা করেন। তিনি আরো বলেন বাংলায় টাকা ফেরৎ না পাঠানো হলে অমৃতসর অপমানিত বোধ করবে। দেশের মানুষের সম্মিলিত চাপের কাছে কিরণচন্দ্র দাস আত্মসমর্পণ করেন। সুভাষ চন্দ্র বসুকে টাকা ফেরৎ পাঠান। তখন থেকেই যতীন্দ্রনাথ দাস প্রদেশিকতার সীমা অতিক্রম করে জাতীয় চরিত্রে উত্তীর্ণ হন।

তাঁর মৃত্যুর খবরে সারা বাংলা উত্তাল হয়ে ওঠে। খবর পাওয়া মাত্রই দক্ষিণ কলকাতার বাজার দোকান বন্ধ হয়ে যায়। যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের নেতৃত্বে *সিমলা ব্যায়াম সমিতি* থেকে এক স্বতঃস্ফূর্ত পদযাত্রা শুরু হয়। শতীন্দ্রনাথ মিত্রের নেতৃত্বে বঙ্গবাসী কলেজের ৪০০ ছাত্র ছাত্রী শ্রদ্ধানন্দ পার্ক পর্যন্ত মিছিল করে। এই মিছিলে কুড়ি জন ছাত্রী অংশগ্রহণ করে এবং তাঁদের মধ্যে দুই জন বঞ্চিতা দেয়। উত্তেজনা সামাল দিতে প্রশাসন কলকাতা শহরে ১৪৪ ধারা জারি করে। কলকাতা পৌরসভার পূর্ব নির্ধারিত সভা বাতিল করা হয়। শান্তিনিকেতনে যখন খবর পৌঁছায় তখন ‘তপতী’ নাটকের মহড়া চলছিল। শোকসত্ত্ব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বার বার অন্যমনস্ক হয়ে পড়ায় মহড়া বন্ধ করে দেওয়া হয়। সেই রাতেই তিনি লিখলেন ‘সর্ব খর্বতারে দহে তব ক্রোধ দাহ’ গানটি।^{২৪} প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসু ১৫-ই সেপ্টেম্বর উপবাস, কাজকর্ম বন্ধ এবং জুতো না পরার মাধ্যমে শোক দিবস পালনের আহ্বান জানান।^{২৫} ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত যুবকদের অনুরোধ করেন যতীন্দ্রনাথের দেহ যখন হাওড়া স্টেশনে পৌঁছবে সবাই যেন সেখানে উপস্থিত থাকে। *অল বেঙ্গল ইউথ এসোসিয়েশনের* পক্ষ থেকে যুবকদের খালি পায়ে হাওড়া স্টেশনে উপস্থিত থাকার আবেদন জানানো হয়। বাংলার বিভিন্ন সংগঠন থেকে স্বেচ্ছাসেবকরা হাওড়া স্টেশনে উপস্থিত হয়। নিখিল বঙ্গ ছাত্র সমিতি উত্তর কলকাতার প্রত্যেকটি কলেজের গেটে পিকেটিং করার জন্য প্রতিনিধি পাঠায়। ১৪-ই সেপ্টেম্বর বহরমপুরে ছাত্রপতি রায়ের নেতৃত্বে স্কুল, কলেজের ছাত্ররা মূল সড়কে বিক্ষোভ দেখায় এবং রাধারঘাটে সভা হয়। ১৫-ই সেপ্টেম্বর চট্টগ্রামে ব্যাপক হরতাল পালিত হয়। ময়মনসিংহের ছাত্ররা স্কুল এবং কলেজের সামনে পিকেটিং করে। কুষ্টিয়া কংগ্রেস কমিটির তরফে ১৫-ই সেপ্টেম্বর হরতাল পালন করা হয়। *কৃষ্ণনগর স্টুডেন্ট এসোসিয়েশন* স্কুল, কলেজের সামনে পিকেটিং করে। ১৬-ই সেপ্টেম্বর রমেন্দ্র ঘোষের স্ত্রী এবং কারমাইকাল লেডি স্কুলের এক শিক্ষিকার নেতৃত্বে কৃষ্ণনগরে ছাত্রীরা মিছিল করে।^{২৬} বাঁকুড়ায় ছাত্ররা ক্লাস বয়কট এবং ছাত্রাবাসে উপবাস করে। চব্বিশ পরগণা জেলায় ১৪-ই সেপ্টেম্বর জনঅরন্ধন পালিত হয়। হাওড়া, হুগলী এবং ২৪ পরগণা জেলার বিভিন্ন মিলে ৫ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। মেদিনীপুরে শোকসভা হয়। দিনাজপুরে ছাত্ররা পরীক্ষা বয়কট করে। বর্ধমানের *শক্তি* পত্রিকা যতীন্দ্রনাথের আত্মত্যাগকে সার্থক করতে দেশবাসীর কাছে বিদেশী দ্রব্য, শিক্ষা, আইন এবং সংস্কৃতি বর্জনের ডাক দেয়।^{২৭}

শোক বার্তা বিদেশ থেকেও আসে। আয়ারল্যান্ডের কর্কের লর্ড মেয়র টেরেন্স ম্যাকসুইনির পরিবার কলকাতার মেয়র যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্তকে টেলিগ্রাম করেছিলেন - ‘টেরেন্স ম্যাকসুইনির পরিবার বেদনা ও গর্বের সাথে যতীন দাসের মৃত্যুর কথা শুনেছে। ভারত স্বাধীন হবেই।’^{২৮} এছাড়াও আইরিশ রিপাব্লিকের পক্ষ থেকে ও’কেলি টেলিগ্রাম করেছিলেন -

‘যতীন্দ্রনাথ দাসের এই বীরোচিত মৃত্যুবরণ যেন ভারতকে তার প্রার্থিত স্বাধীনতা এনে দিতে পারে।’^{২৪} পানামার ভারতীয়রা ২৫ শে অক্টোবর এক জনসভায় মিলিত হয়ে যতীন দাসের আত্মত্যাগে গভীর দুঃখ প্রকাশ করে।^{২৫}

যতীন্দ্রনাথের অনশন সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধী কোনো প্রতিক্রিয়া দেননি। অমৃতসরের *হিউম্যানিস্টিক সোসাইটি* যতীন্দ্রনাথের প্রাণ রক্ষার জন্য মহাত্মা গান্ধীকে লাহোরের কংগ্রেস নেতাদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়ার অনুরোধ করেন। কিন্তু কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার আগেই যতীন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পরও মহাত্মা গান্ধী কোনো মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকেন। এক চিঠির উত্তরে তিনি জানান যদি এবিষয়ে কিছু বলতেন এর বিরুদ্ধেই মতামত দিতেন।^{২৬} যতীন্দ্রনাথের আত্মত্যাগকে তিনি একটি ‘পৈশাচিক আত্মহত্যা’ বলে মনে করেন। গান্ধী এই অবস্থানের জন্য বিভিন্ন মহলে সমালোচিতও হয়েছেন। গান্ধী বোধহয় অনশনকে অহিংস আন্দোলনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে বেশি আগ্রহী ছিলেন। সশস্ত্র সংগ্রামে বিশ্বাসী বিপ্লবীদের অনশনকে তিনি মেনে নিতে পারেননি। মহাত্মা গান্ধী প্রতিক্রিয়া না দিলেও কংগ্রেস নেতারা চুপ করে থাকেননি। অনশন চলাকালীন সময় থেকে তাঁরা যতীন্দ্রনাথের সমর্থনে সোচ্চার হয়। হাওড়া স্টেশনে যতীন্দ্রনাথের দেহ গ্রহণ করতে সালকিয়া কংগ্রেস কমিটি থেকে ১২০ জন, হাওড়া কংগ্রেস কমিটি থেকে ১৫০ জন, প্রাদেশিক কংগ্রেস থেকে ৪০০ জন স্বেচ্ছাসেবক উপস্থিত ছিলেন।^{২৭} যতীন্দ্রনাথের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া থেকে স্মৃতি রক্ষায় বাংলার প্রাদেশিক কংগ্রেস নেতারা মুখ্য ভূমিকা পালন করে। শুধু তাই নয়, তৎকালীন বাংলায় সুভাষচন্দ্র বসু এবং যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের দ্বন্দ্বের অন্যতম হাতিয়ার হয়ে ওঠেন যতীন্দ্রনাথ দাস। উভয় পক্ষই যতীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ নিয়ে বক্তৃতার তীব্রতা বাড়াই। যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত তাঁকে নির্দোষ দাবি করেন। তিনি জলপাইগুড়িতে বলেন কোনোরকম প্রমাণ ছাড়া যতীন্দ্রনাথকে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় ফাঁসানো হয়েছে।^{২৮} যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত বিভিন্ন সভা সমিতিতে উত্তেজক বক্তৃতা দিতে শুরু করেন। যতীন্দ্রনাথকে হাতিয়ার করে তিনি সুভাষচন্দ্র বসুর থেকে বেশি জনপ্রিয়তা লাভে আগ্রহী ছিলেন।^{২৯} উভয় পক্ষই একাধিক সভা, শোভাযাত্রার উদ্যোগ নেয়। সুভাষচন্দ্র বসুর উদ্যোগে প্রাদেশিক কংগ্রেস ‘যতীন দাস মেমোরিয়াল ফান্ড’ গঠন করে। এই ফান্ড পরিচালনার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। কিন্তু এই কমিটিতে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ব্যতীত তাঁর পক্ষের আর কাউকে না রাখায় তিনি থাকতে অস্বীকার করেন। যদিও তিনি ফান্ডের জন্য অর্থ সংগ্রহে যথাসাধ্য সাহায্য করবেন কথা দেন।^{৩০}

যতীন্দ্রনাথ দাস তাঁর মৃত্যু দিয়ে বাংলার সমস্ত রাজনৈতিক দলকে এক ছাতার তলায় নিয়ে আসেন। তাঁর অন্তিম শোভাযাত্রায় ওয়ার্কারস এন্ড পেজান্ট পার্টি একটি বড় লাঙাল নিয়ে যোগ দেয়। এছাড়াও নিখিল বঙ্গ যুবক সমিতি, নিখিল বাংলা ছাত্র সমিতি, বি.পি.সি.সি-র ভলেন্টারি বাহিনী, তরুণ সংঘ, মহাবীর দল এবং বিভিন্ন শরীর চর্চার প্রতিষ্ঠান প্রমুখরা যোগদেয়। তাঁরা স্বরাজ পতাকার পাশাপাশি লাল পতাকা এবং পোস্টার নিয়ে আসে। এইসব পোস্টারের বাণী থেকে স্বেচ্ছাসেবকদের বৈচিত্র্য ধরা পড়ে। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল – ‘বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক’, ‘সাম্রাজ্যবাদের পতন হোক’, ‘প্রতিহিংসা চাই’, ‘Long Live Proletarian Revolution’, ‘রক্ত বিনা দেশ কি কখনো স্বাধীন হয়?’, ‘বিদেশী কাপড় জ্বালিয়ে দাও, খাদি পরো’। কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক থেকে কমিউনিষ্ট মনোভাবাপন্ন যুবকরা, বিপ্লবীরা, মুসলিম লিগের সদস্যরা সকলে তাঁর অন্তিম যাত্রায় অংশগ্রহণ করে।

যতীন্দ্রনাথের আত্মত্যাগ ভারতের যুব সমাজকে বিশেষ প্রভাবিত করে।^{৩১} সুভাষচন্দ্র বলতেন ‘বাংলার যুব সমাজে আমি হাজার হাজার যতীন দাস চাই’। বিপ্লবীরা যতীন্দ্রনাথের অন্তিম যাত্রায় ‘Red Leaflets’ বিতরণ করে মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়ার আহ্বান জানায়।^{৩২} যতীন্দ্রনাথের মৃত্যুর প্রতিবাদে মিটিং মিছিলের মূল উদ্যোক্তা ছিল ছাত্র এবং যুব সংগঠন গুলো। স্কুল, কলেজের ক্লাস বন্ধ করে শোক মিছিলে যোগ দেওয়া ছিল খুব সাধারণ বিষয়। শহীদকে সম্মান জানাতে সমস্ত মিছিলেই তাঁরা খালি পায়ে এবং অনাবৃত মস্তকে অংশগ্রহণ করে। আর সভা গুলোতে মূল আলোচ্য বিষয় ছিল যতীন দাসের মহান কর্মজীবন। নেতারা ছাত্র, যুবকদের যতীন্দ্রনাথের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হতে আহ্বান করেন। এই সময় বাংলার বিভিন্ন যুব ও ছাত্র সংগঠন গুলি তাঁর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে কংগ্রেসের কার্যক্রমের সাথে মিশে যায়। যতীন্দ্রনাথের মৃত্যু নিয়ে আক্রমণাত্মক বক্তৃতা এবং সংবাদপত্রের নিবন্ধ জনমানসে দারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি করে।^{৩৩}

আইন অমান্য আন্দোলনের পূর্বে যতীন্দ্রনাথের শোকযাত্রায় মহিলাদের ব্যাপক অংশগ্রহণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। লাহোরে মহিলারা অশ্রু নয়নে তাঁকে বিদায় জানায়। প্রত্যেকটি স্টেশনে যতীন্দ্রনাথকে দেখতে তাঁরা ভিড় জমায়। হাওড়া স্টেশনে প্রভাবতী দাশগুপ্তের নেতৃত্বে ২২ জন স্বেচ্ছাসেবক মহিলা উপস্থিত ছিল। লতিকা বোসের নেতৃত্বে ১৫০ জন মহিলা যতীন্দ্রনাথের অন্তিম যাত্রায় যোগ দেয়। শরৎ বসুর স্ত্রী বিভাবতী দেবী ছোট শিশির বসুকে সঙ্গে নিয়ে এই শোভাযাত্রায় সামিল হয়। এই শোভাযাত্রায় মহিলা ও ছাত্রীদের অংশ গ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো। তারা গাইছিল – ‘রক্তে আমার লেগেছে যে আজ সর্বনাশের নেশা...।’ রাস্তার দু’পাশে বাড়ির জানালা থেকে অশ্রুসিক্ত নয়নে মহিলারা গোলাপ জল, খই এবং ফুল, চন্দন অর্পণ করেন আর মুর্ছমুহু শব্দ ধ্বনিত বীরকে সম্মান জানায়। ব্রাহ্মসমাজের ছাত্রী নিবাসে ছাত্রীরা রবিবার উপবাস পালন করে। সাতকড়িপতি রায়ের সভাপতিত্বে হাজরা পার্কের এক সভায় ১০০ জন মহিলা যোগ দেয়।

যতীন্দ্রনাথ তাঁর মৃত্যুর বিনিময়ে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষকে একসূত্রে বাঁধতে পেরেছিলেন। কারা অনুসন্ধান কমিটির প্রতিশ্রুতি স্বত্তেও যতীন্দ্রনাথকে নিঃশর্তে মুক্তি দিতে টাল বাহানা দেখে ১২-ই সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় আইন সভায় এন. সি. কেলকার, দেওয়ান চমনলালের সঙ্গে এম. এ. জিন্নাও তীব্র প্রতিবাদ জানায়। যতীন্দ্রনাথের দেহ কলকাতায় পাঠাতে দিল্লীর এক মুসলিম ব্যবসায়ী পঞ্চাশ টাকা পাঠায়। তাঁর মৃত্যুর পর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় জর্জরিত লাহোরের ঐক্যবদ্ধ রূপ কিরণচন্দ্র দাসকে অবাক করে দেয়। বোম্বের মুসলিম স্টুডেন্ট ইউনিয়ন ব্রেলভির সভাপতিত্বে যতীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে।^{৭৯} বঙ্গবাসী কলেজের ছাত্র ওসমানি তাঁর বক্তৃতায় সহপাঠীদের যতীন্দ্রনাথের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানায়। কলকাতায় যতীন্দ্রনাথের অন্তিম যাত্রায় মুসলিমদের সবুজ পতাকা কম ছিলনা। ছাত্র শিক্ষক সমিতির আবদুর রহিম যতীন্দ্রনাথের নামে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে মুসলিম ছাত্রের সংখ্যা বৃদ্ধির দায়িত্বে ছিলেন। সৈয়দ মহম্মদ ইমাহক ১৮ সেপ্টেম্বর *সোলতান-এ* যতীন্দ্রনাথের নায়কের মত মৃত্যু বরণের ভূয়সী প্রশংসা করেন।^{৮০} কলকাতায় খিলাফত কমিটির এক সভায় যতীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হয়। তবে গোয়েন্দা দপ্তরের রিপোর্টে মুসলিমদের নিক্ষেপিত হাবি সর্বাত্মে মেনে নেওয়া যায়না। গোয়েন্দা দপ্তরের প্রতিবেদনে এবং সংবাদপত্রে প্রকাশিত শ্লোগান ‘সং শ্রী আকাল’, ‘আল্লা হো আকবর’ থেকেও বৈচিত্র্য চোখে পড়ে। আবার মথুরাবাসীর কাছে যতীন্দ্রনাথ দাস ‘কৃষ্ণ ভক্ত দাস’-এ পরিণত হয়। কলকাতায় যতীন্দ্রনাথের শোক যাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল হরিনাম সংকীর্তন। পাঞ্জাব নওজোয়ান সভার বাংলা শাখা যতীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে। প্রেম সিং প্রেমের নেতৃত্বে ষাট জন শিখ স্বেচ্ছাসেবক হাওড়া স্টেশনে উপস্থিত ছিল। এছাড়াও গুরুদ্বার গুলোতে শোক সভা পালিত হয়। ১৫-ই সেপ্টেম্বর কলকাতা বিহারী ক্লাবের সাধারণ সভা বাতিল করে দেওয়া হয়। মাড়োয়ারীরা যতীন্দ্রনাথের শোক মিছিলে লেবুর সরবত এবং একটি এম্বুল্যান্স দেয়।

মৃত্যুর পর যতীন্দ্রনাথের দেহ যেন দেবত্বে উন্নীত হয়। ড. আলম বলেছিলেন মৃত্যুর পর তাঁর দেহ পবিত্রতা, মহত্ত্ব ও দিব্যতার প্রতীক হয়ে ওঠে। হাওড়া টাউন হলে শায়িত শবাধারকে একবার ছুঁয়ে দেখার, পূজা করার জন্য সারা রাত মানুষের ঢল নামে। একইরকম উত্তেজনা শশ্মানেও দেখা যায়। চিতাভস্ম নেওয়ার জন্য কাড়া কাড়ি পড়ে যায়। অধ্যাপক নৃপেন্দ্র চন্দ্র ব্যানার্জী ছাত্রদের যতীন্দ্রনাথের চিতাভস্ম কপালে তিলক রূপে লেপন করে তাঁর মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়ার প্রতিজ্ঞা করতে আহ্বান করেন। তিনি আরো বলেন আপনাদের মধ্য থেকেই হাজার হাজার যতীন দাসের জন্ম হোক।^{৮১} ভবিষ্যতে *বেঙ্গল ভলেন্ট্যারিসদের* দীক্ষা দেওয়ার জন্য চিতাভস্ম রেখে দেওয়া হয়। সুভাষচন্দ্র বসু এক কাগজের মোড়কে যতীন্দ্রনাথের চিতাভস্ম নিয়ে বিভাবতী দেবীকে দিয়ে ছিলেন যত্ন করে রেখে দেওয়ার জন্য।^{৮২} তাঁর মৃত্যু, মৃতদেহ এমনকি চিতাভস্মও দেশের মানুষকে যেভাবে দেশপ্রেমে উদ্বেলিত করেছিল তাতে তাঁকে প্রকৃতই ‘দধীচি’ বলা যায়।

যতীন্দ্রনাথের আত্মবলিদানের স্মৃতিকে চিরস্থায়ী করার জন্য বাসন্তী দেবী ‘*নিখিল ভারত যতীন্দ্রনাথ স্মৃতি ভান্ডার*’-র উদ্যোগ নেয়। এর কর্মসূচীতে শশ্মান ঘাটে একটি স্মৃতি মন্দির, কলকাতায় যতীন্দ্রনাথের একটি মূর্তি, লাহোরে একটি স্মৃতি মন্দির স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। এছাড়াও ২৬শে সেপ্টেম্বর সুভাষচন্দ্র বসুর সভাপতিত্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির কার্য্যকরী সভার একটি অধিবেশনে যতীন্দ্রনাথের স্মৃতি রক্ষার জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়।^{৮৩} কলকাতার শিক্ষক এবং ছাত্ররা ২৬ সেপ্টেম্বরের এলবার্ট হলের এক সভায় যতীন্দ্রনাথের স্মৃতি রক্ষায় একটি কমিটি গঠিত হয় যার সভাপতি

প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, সম্পাদক নৃপেন্দ্র চন্দ্র ব্যানার্জি। এছাড়াও যতীন্দ্রনাথের নামে একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ার প্রস্তাব নেওয়া হয়।^{৪৪}

যতীন্দ্রনাথ দাসের আত্মত্যাগ তাঁকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে। যে দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের সাথে তিনি দীর্ঘ তেষষ্টি দিন লড়াই করেন তা এখনও ভাবতে বিস্ময় জাগায়। যতীন্দ্রনাথের মৃত্যু সারা দেশে ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে।^{৪৫} তাঁর মৃত্যু দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মবলিদানের সংজ্ঞাই বদলে দেয়।^{৪৬} ১৯-শে অক্টোবর ১৯২৯ লাহোরে অনুষ্ঠিত পাঞ্জাব ছাত্র সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণে সুভাষচন্দ্র বসু বলেন যতীন্দ্রনাথ তাঁর আত্মত্যাগ ও দুঃখ ভোগের মধ্য দিয়ে অমর হয়ে আছেন। তিনি মানুষের মধ্যে আদর্শ ও স্বপ্নরূপে বেঁচে আছেন।^{৪৭} যেকোনো অবস্থাতেই প্রাণ দেওয়া অত্যন্ত কঠিন কাজ। লোকচক্ষুর আড়ালে নিজেকে একটু একটু করে শেষ করে দেওয়া আরো কষ্টকর। তাঁর এই লড়াই সারা ভারতের সহানুভূতি আদায় করে নেয়। বাংলার বহু বিভক্ত রাজনীতিকের ক্ষণিকের জন্য হলেও এক সূত্রে বাঁধতে পেরেছিলেন। দেশের জন্য আত্মত্যাগ অনেকে করেছেন কিন্তু তাঁর মত মৃত্যুকে হাতিয়ার কেউ করেনি। তাঁর মৃত্যুতে শোক জ্ঞাপন করে ভারতবর্ষ যথার্থই লিখেছিল –

“ছয়মাস পূর্বে এই যতীন্দ্রনাথকে কয়জন চিনিত? তাঁহার নিজের পরিবারবর্গ, তাঁহার কলেজের সহপাঠীরা এবং তিনি দক্ষিণ কলিকাতা কংগ্রেস কমিটির সহকারী সম্পাদক ছিলেন, সেইজন্য কংগ্রেস সংশ্লিষ্ট জনকয়েক লোক – ইহাই ছিল তাঁহার জগতের পরিধি। কিন্তু আজ সেই পরিধি বিস্তৃত হইয়া বিশ্বময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আজ তিনি তাঁহার পরিবার বর্গের নহেন, বাঙ্গালা দেশের নহেন, ভারতের নহেন, এশিয়ার নহেন – আজ তিনি সমগ্র বিশ্বের যতীন্দ্রনাথ।”^{৪৮}

Reference:

1. Condition of Hunger Strikers – Still Critical, Report, Liberty, 3rd August, 1929, Kolkata, p. 3
2. Laushey, David M., Bengal Terrorism and the Marxist Left: Aspects of Regional Nationalism in India 1905 – 1942; First Edition, Kolkata: Firma K. L. Mukhopadhyay 1975, p. 21
3. সেনগুপ্ত, সুবোধচন্দ্র, (সম্পা.), সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান, প্রথম সং., কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ১৯৭৬, পৃ. ৪২৩
4. সরকার, আশিস, অগ্নিগর্ভ উনত্রিশ ও যতীন দাস, প্রথম সং., কলকাতা: অমর ভারতী, ২০১৬, পৃ. ৮৮
5. Samanta, Amiya K., Terrorism in Bengal: A Collection of Documents on Terrorist Activities from 1905 to 1939, Vol-1; First Edition, Kolkata: Government of West Bengal, 1995, p. 466
6. অধিকারী, সন্তোষকুমার, শহীদ যতীন দাস ও ভারতের বিপ্লব আন্দোলন, প্রথম সং., কলকাতা: জে এন ঘোষ এন্ড সন্স, ১৯৭২, পৃ. ২৬
7. সরকার, আশিস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯
8. Warich, Malwinder Jit Singh (eds.), Profile of a Martyr Jatin Das: A First Hand Account by His Brother Kiron Das, Second Edition, Mohali: Unistar Book, 2015, p. 25
9. হাবিব, এস. ইরফান, ভগৎ সিং ও তাঁর সহযোগীরা: ঔপনিবেশিক ভারতে বিপ্লব-প্রয়াসের একটি অধ্যায়, অনু. শান্তনু চক্রবর্তী, প্রথম সং., কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ২০১৫, পৃ. ২৯
10. Warich, Malwinder Jit Singh, op.cit, p. 29
11. বসু, সুভাষচন্দ্র, ভারতের মুক্তি সংগ্রাম ১৯২০-১৯৪২, ১ম খ.; অনু. গৌরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিতীয় সং., কলকাতা: নেতাজী রিসার্চ ব্যুরো, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৬৯
12. বর্মা, শিব, শহীদ স্মৃতি, প্রথম সং., কলকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, ১৯৮৩, পৃ. ১১৭

১৩. অধিকারী, সন্তোষকুমার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭
১৪. রাজনৈতিক “আসামী”দের প্রয়োপবেশন, প্রবাসী, স. রমানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ভাদ্র, ১৯৩৬, এলাহাবাদ, পৃ. ৭৮৫
১৫. Jatin Das in Precarious Condition, Report, Liberty, 27th July, 1929, Kolkata, p. 5
১৬. হাবিব, এস. ইরফান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮
১৭. S. Jatin Das on Death Bed, Report, Liberty, 7th September, 1929, Kolkata, p. 6
১৮. দে, শৈলেশ, ওরা আকাশে জাগাতো ঝড়, প্রথম সং., কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮৩, পৃ. ৮২
১৯. ‘যতীন্দ্রনাথ’, ভারতবর্ষ, স. জলধর সেন, কার্তিক, ১৩৩৬, কলকাতা, পৃ. ৮১৪
২০. Banerji, Nripendra Chandra, At The Cross-Roads 1885-1946, First Edition, Kolkata: Jijnasa, 1974, p. 209
২১. Jatin Das Expires, Report, Liberty, 14th September, 1929, Kolkata, p. 5
২২. বর্মা, শিব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩
২৩. India's Greatest Martyr, Report, Liberty, 18th September, 1929, Kolkata, p.7
২৪. ঘোষ, শান্তিদেব, রবীন্দ্র সঙ্গীত, পঞ্চম সং., কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৩৮৬ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২০৪
২৫. The Martyr Comes Home, Report, 17th September, 1929, Kolkata, p. 6
২৬. ‘Demonstrations in Connection with the death of Jatin Das’ File No. 339/29, IB Reports, WBSA, Kolkata.
২৭. Report on Newspapers and Periodicals in Bengal: For the week Ending Saturday, 19th October 1929; RNP, p. 604
২৮. বসু, সুভাষচন্দ্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৯
২৯. অধিকারী, সন্তোষকুমার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬
৩০. Panama Indians Appreciate His Self-Sacrifice, Report, Amrita Bazar Patrika, 17th December, 1929, Kolkata, p. 6
৩১. সুভাষচন্দ্র বসু, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭১
৩২. Jotin Das – Expected Death, File No.684/29 (1-13), Home Confidential, WBSA, Kolkata.
৩৩. ‘The Mayor’s Speech’; Report, The Calcutta Municipal Gazette, 21 September 1929, Kolkata.
৩৪. ‘Fortnightly Reports on the Political Situation in Bengal for the Year 1928-39’ File No. 90/1928, IB Reports, WBSA, Kolkata.
৩৫. বসু, সৌম্য, বিতর্কিত দেশনায়ক: সুভাষচন্দ্র বসুর রাজনীতি: ১৯২১-১৯৪১, প্রথম সং., কলকাতা: বুকপোস্ট পাবলিকেশন, ২০২২, পৃ. ১৫৮
৩৬. এস. ইরফান হাবিব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪
৩৭. Ghosh, Pradyot Kumar, ‘Revolutionary Movement in North India 1928-34’, in Amitabha Mukherjee (eds.), Militant Nationalism in India 1876-1947, First Edition, Kolkata: Institute of Historical Studies, 1995, p. 63
৩৮. ‘Fortnightly Reports on the Political Situation in Bengal for the Year 1928-39’, File No. 90/1928, IB Reports, WBSA, Kolkata.

৩৯. Homage of All Classes and Communities, Report, Liberty, 16th September, 1929, Kolkata, p. 5
৪০. Report on Newspapers and Periodicals in Bengal: For the week Ending Saturday, 28th September 1929; RNP, p. 582
৪১. Venu, C. S., Jatin Das: The Martyr, First Edition, Madras: C. S. Cunniah, N D, p. 46
৪২. বসু, শিশিরকুমার, বসু-বাড়ি, প্রথম সং., কলকাতা: পূর্ণ প্রকাশন, ১৯৬৫, পৃ. ৪০
৪৩. যতীন্দ্রনাথ দাসের শেষ যাত্রা, প্রবাসী, স. রমানন্দ চট্টোপাধ্যায়, কার্তিক, ১৩৩৬, এলাহাবাদ, পৃ. ১৫২
৪৪. 'Demonstrations in Connection with the death of Jatin Das' op.cit
৪৫. নেহরু, জওহরলাল, আত্ম-চরিত, অনু. সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, চতুর্থ সং., কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৪৬
৪৬. যতীন্দ্র স্মৃতিপূর্ণ, প্রবর্তক, স. মতিলাল রায়, আশ্বিন, ১৩৩৬, কলকাতা, পৃ. ৫৬৬
৪৭. বসু, সুভাষচন্দ্র, তরুণের স্বপ্ন, চতুর্থ সং., কলকাতা: শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ১৩৫২ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১০২
৪৮. 'যতীন্দ্রনাথ', ভারতবর্ষ, স. জলধর সেন, কার্তিক, ১৩৩৬, কলকাতা, পৃ. ৮১০